সাহিত্য পর্যালোচনা

সুগত চাকমা, তার "বাংলাদেশ এর উপজাতি ও আদিবাসীদের সমাজ সংস্কৃতি ও আচার ব্যবহার" গ্রন্থে বলেন খাসিয়ারা মাতৃতান্ত্রিক। তাদের পরিবারের মুখ্যত মাতা হলেন প্রধান ব্যক্তি।

খাসিয়ারা মূলত মাতৃতান্ত্রিক সম্প্রদায় এই কারণে খাসিয়া সমাজ ব্যবস্থায় মেয়েদের সম্মান ও আলাদা মর্যাদা রয়েছে। খাসিয়াদের মধ্যে প্রবাদ রয়েছে ' লংজাইদনা কিন থেই' অর্থাৎ নারীদের হাতে মানবজাতির উৎপত্তি। এদের পরিবারের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন নারীরা। নারীরা কনে যাত্রী নিয়ে বিয়ে করে বর নিয়ে আসেন বাড়িতে। আর নারীরা নিজেদের বাড়িতেই পিতা মাতার সঙ্গে স্বামী সন্তান সহ বসবাস করে থাকেন। সমাজ ব্যবস্থায় পরিচালিত খাসিয়াদের কোন পুরুষ সম্পত্তির মালিক হন না। স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পদের মালিক হন নারীরা। পুরুদের বিয়ে হলে তারা গিয়ে ওঠেন শ্বশুরবাড়িতে তারা বাড়ির কাজ ও পানের জুমে কাজ করে পরিবারকে সহায়তা করেন। স্ত্রীর বাড়িতে পুরুষরা কাটিয়ে দেন জীবনের বাকি দিনগুলো। পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ মেয়ের ধন সম্পদে বেশি প্রাধান্য থাকে। এদের বংশ পরিচয় দেয়া হয় মায়ের বংশানুক্রমে।

মেসবাহ কামাল সম্পাদিত আদিবাসী জনগোষ্ঠী গ্রন্থে বলা হয়েছে সাড-সুক-মেনসিম খাসিয়া জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহ্যবাহী উৎসব।

খাসি নৃগোষ্ঠীর উৎসব সাড-সুক-মেনসিম

সাড-সুক-মেনসিম হল হাসির জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহ্যবাহী উৎসব। সাড-সুক-মেনসিম এর অর্থ হল হৃদয়ের আনন্দ নৃত্য। এটি মূলত নাচ-পর্ব। ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ প্রদানের পর্ব হিসেবে এই উৎসব পালিত হয়। খাদ্যশস্যের অধিক ফলন, সম্পদ, সুস্বাস্থ্য, এবং শান্তির জন্য ঈশ্বরের অশেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এই নাচের উৎসবটি পালন করা হয়। খাসি সমাজের পুরোহিত এসময় ঈশ্বরের প্রতি প্রার্থনায় সাধারণ জনগণকে নেতৃত্ব দেন। মানুষের কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের আশীর্বাদ চেয়ে এই প্রার্থনা করা হয়। সাড-সুক-মেনসিম উৎসবের সময় নারী পুরুষ উভয়েই বর্ণিল পোশাক পরে গভীর ভক্তি ও একাগ্রতা সাথে নাচতে থাকেন। এ সময়ে ঢোল(খাসি বাসায় যার নাম কা-বম) এবং বাঁশি ও পাইপ (খাসি বাসায় যার নাম তাংমুড়ি)বাজানো হয় যা উৎসবের আমেজকে আরো বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। প্রতি বছরের এপ্রিল মাসে এই উৎসব পালন করা হয়। এই উৎসবের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি ও উর্বরতার চিরন্তন রূপকে প্রতীকী অর্থে ফুটে তোলা হয়। নারীরা এখানে বীজ এবং ফসলের বাহক হিসেবে ভূমিকা পালন করে। আর পরুষের আনে ফসল তুলার ভূমিকা। ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা প্রতিদান স্বরূপ নাচের এই উৎসবটি খাসিদের হৃদয়ে বিশেষ স্থান বহন করে আছে।

ভারতের মেঘালয় রাজ্যে এই উৎসবটি সবচেয়ে ব্যাপক আকারে পালন করা হয়। ঐ রাজ্যে খাসিদের জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি। তবে মেঘালয় ছাড়া ভারত এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যেখানে খাসি জনগোষ্ঠীর মানুষ বাস করে সেখানেও সাড-সুক-মেনসিম উৎসব যুগ যুগ ধরে উদযাপিত হয়ে আসছে।

সৌরভ শিকদার তার বাংলাদেশের আদিবাসী ভাষা গ্রন্থে বলেছেন খাসিয়া দের ভাষার নাম খাসিয়া বা হাসি ভাষা। খাসি ভাষার সাথে বার্মার মোয়ে, পলং বাসার এবং উপমহাদেশের তালাং-ঘেড়, সুক, আনাম, খায়েম, চোয়েম, ক্ষং, লেমেত, ওয়া প্রভৃতি আদিবাসীদের ভাষার মিল আছে। অন্য ভাষার মতো খাসিয়া বাসাতেও আঞ্চলিক ভাষার অস্থিত্ব লক্ষ্য করা যায়। অঞ্চল ব্যাধ বিচার করে খাসিয়া ভাষাকে প্রধান চারটি ভাষা অঞ্চলে ভাগ করা হয় এগুলো হচ্ছে ওয়ার(কুলাউড়া অঞ্চলের ফাঁসি ভাষা), পারর (ভারতের মেঘালয়ে ও সিলেটের জয়ন্তায় বসবাসকারীদের ভাষা), আমজলং (মৌলভীবাজারে প্রচলিত খাসি ভাষা) এবং নংউরা (সুনামগঞ্জে প্রচলিত খাসিয়া ভাষা)। খাসিয়া ভাষা অস্ট্রো- এশিয়াটিক বাসা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এই বাসার নিজস্ব কোন বর্ণমালা নেই । এক সময় খাসিয়া ভাষা বাংলা হরফে লিখিত হতো। বাংলা হরফে বাইবেলের কিছু অংশ খাসিয়া বাসায় প্রথম অনূদিত হয়েছিল। বর্তমানে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের খ্রিস্টান মিশননারিদের প্রচেষ্টায় রোমান অক্ষরের হাসি ভাষা লিখিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের খাসিয়া জনগোষ্ঠী ও তাদের লোক উৎসব সৌমিত্র দেব প্রকাশ জুলাই-২০১৯ এ বলা হয়েছে খাসিয়ারা অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ জনগোষ্ঠী ।

যেকোনো আদিবাসী বা জাতি সত্তার কাছে ধর্ম ও নৈতিকতা অন্তর্যমজ বিষয়। খাসিয়ারাও তার ব্যতিক্রম নয়। তাদের উৎসবের মধ্যে সেই কারণেই ধর্ম ও নৈতিকতার প্রভাব রয়েছে। খাসিয়ারা অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ জনগোষ্ঠী। তাদের জীবন, ক্রিয়াকর্ম ও চিন্তা চেতনা ধর্মীয় চেতনা দ্বারা গভীরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। তাদের জীবনে ঈশ্বরের ভূমিকা সম্পর্কে তারা অত্যন্ত সচেতন। ধারণা করা হয় ব্রিটিশরা আসার আগে খাসিয়া রাজ্য সিলেটের কিছু অংশসহ খাসিয়া পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তখন পর্যন্ত খাসিয়ারা তাদের আদি ধর্ম পালন করতেন। কিন্তু তাদের রাজ্যে ব্রিটিশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর সেখানে খ্রিস্টান ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটে। খাসিয়ারা এই নতুন বিশ্বাসকে স্বাগত জানান এবং হাজার হাজার খাসিয়া খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে অবশ্য মিশনারিরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। খ্রিস্টান ধর্ম খাসিয়ারা জীবনে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আনে। ক্রিস্টান হওয়ার পর তাদের ও উৎসব হয়ে ওঠে বড়দিন। প্রতিদিন চার্চে খ্রিস্টীয় কায়দায় শুরু হয় খাসিয়াদের সংগীত।

সিকদার এন্ড বিশ্বাস ২০১৩ প্রকাশিত আর্টিকেলে বলেন খাসিদের সংস্কৃতি এবং জীবিকা নির্বাহের ধরন মূলধারার মানুষের থেকে আলাদা খাসিয়ারা ঐতিহ্যগত ভাবেই কৃষিকাজে জড়িত এটা তাদের নির্ধারিত পেশা তারা এখনো তাদের জমি চাষে সনাতন পদ্ধতি ব্যবহার করে। তারা চাষের জন্য ষাঁড়, কুদাল, লাঙ্গল ইত্যাদি উপনির্ভর করে।

পান চাষ তাদের প্রধান পেশা, এছাড়া তারা সমতল ভূমিতে সুপারি ও অল্প সংখ্যক ধান উৎপাদন করে। মূলত তারা তাদের নিজেদের ব্যবহারের জন্য পণ্য উৎপাদন করে এবং উদ্রিত পণ্য বাজারে বিক্রি করে।

দাস এন্ড মান্থলি ২০১৬ তাদের প্রকাশিত একটি আর্টিকেলে মেঘালয়ের খাসিয়া নারীদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক নিয়ে আলোচনা করেন সেখানে তারা উল্লেখ করেন নারীদের সামাজিক অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে স্বাধীনতা রয়েছে। পরিবার কাঠামো এবং পারিবারিক সংগঠন নারীদেরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। কারণ নারীরাই সম্পত্তির উত্তরাধিকার হয়ে ঘর পরিচালনা করে এবং বংশপরম্পরায় তাদের বংশের নাম এগিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু ঘরের বাইরে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীরা পিছিয়ে আছে। নারীরা ঘর পরিচালনা করলেও তারা গ্রামের প্রধান হতে পারে না। বরং নারীর স্বামী গ্রাম প্রধান হন। নারীরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে কম আগ্রহী। তারা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা পুরুষদের হাতে ছেড়ে দেয়। এমনকি কৃষি ক্ষেত্রে নারীরা নীতি নির্ধারণে খুবই কম ভূমিকা পালন করছে। নীতি নির্ধারণে নারীদের এই পিছিয়ে থাকার পেছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো নারীরা ঘরোয়া ক্ষেত্রকে তাদের প্রধান হিসেবে বিবেচনা করছে।

ডে এন্ড ঘুষ ২০০৭ তাদের প্রকাশিত একটি আর্টিকেলে বলেন অধিকাংশ খাসিয়ারা সমাজে দরিদ্র হলেও সমাজে নারীরা সবসময় একটি বিশেষ অবস্থান ও ভূমিকার অধিকারী হয়ে থাকেন নারীদেরকে সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সম্মান দেয়া হয় মেঘালয়ের খাসিয়া সম্প্রদায় এমন একটি সমাজ অনুসরণ করে যেখানে নারীরা কর্তৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকার তার মায়ের মাধ্যমে লাভ করে। তাই এটি মনে করা হয় যে নারীদের সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক বা মনস্তাত্ত্বিক বুঝে পড়া এবং জ্ঞান অর্জনের জন্য আলাদা করে অধিকার আন্দোলনের প্রয়োজন নেই কারণ তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমাজের সম্মানিত স্তরে স্থান পেয়েছে তাদের রয়েছে শিক্ষার আবাদ প্রবেশাধিকার। পরিবার ও সমাজের কর্তৃত্ব উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির মালিকানা সহ রয়েছে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা। তবে মেঘালয়ের গ্রামীন এলাকায় সাম্প্রতিক একটি পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে পুরুষের নেতৃত্বে পরিবারের সংখ্যা নারীদের নেতৃত্বে থাকা পরিবারের তুলনায় সংখ্যায় বেশি।

জাহানারা হক তার বাংলাদেশ আদিবাসী গ্রন্থে বলেন বর্তমানে আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে খাসিয়া সমাজ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই খ্রিস্টান মিশন নারীদের প্রচেষ্টায় এবং সার্বিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাদের শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে । ফলে হাসিয়া সমাজ উচ্চত্বর শিক্ষায় ব্যাপক হারে উচ্চশিক্ষিত হতে না পারলেও প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণে অনেক এগিয়ে আছে। হাসিয়া সমাজে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের শিক্ষার হার বেশি বিভিন্ন এনজিও এবং সংখ্যালঘু হাসিয়া সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নানাভাবে সাহায্য করে চলেছে।

সারণী ১৩

বর্তমান খাসিয়া সমাজের মেয়েদের মর্যাদা সম্পর্কে মতামত

বর্তমানে মেয়েদের মর্যাদা	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
খুব বেশি	০৭	১৬%
পুরুষের সমান	১৯	৫৬%
পুরুষের চেয়ে কম	০৯	২৮%
মোট	৩৫	১০০%
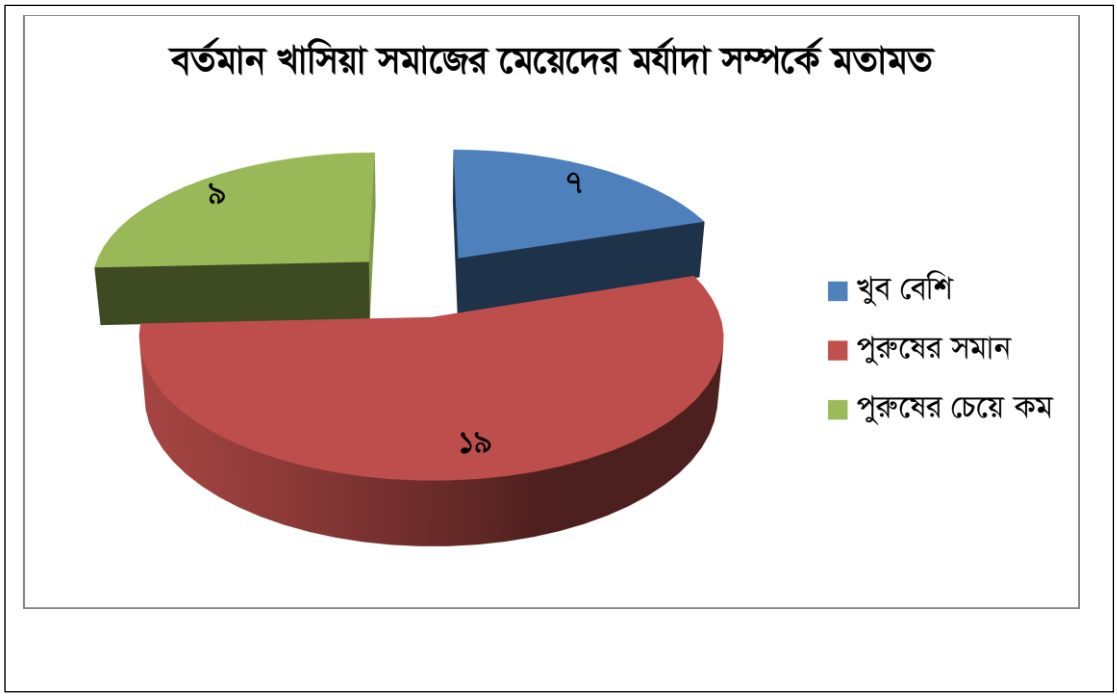
চার্ট নং- ১৩